ডা. মোজাহার উদ্দিন আহমেদ

বিভুরঞ্জন সরকার

একটি রাজনৈতিক পরিবারের কথা

নানা ঘটনাতেই বুঝতে পারছি যে, আমারও বয়স বাড়ছে। প্রায়ই মনে হয় অতীতের কথা, পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। কত স্মৃতি, কত ঘটনা। কত মানুষের মুখ ভেসে ওঠে মনের পর্দায়। আজ লেখার বিষয় ঠিক করতে গিয়ে মনে পড়লো আমার এলাকার একটি রাজনৈতিক পরিবারের কথা। আমার বাড়ি পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায়। আমাদের এলাকায় অনেক রাজনৈতিক নেতার জন্ম হয়েছে। যাদের কেউ কেউ জাতীয় পর্যায়েও পরিচিতি পেয়েছেন। কিন্তু আমি আজ বলবো ডা. মোজাহার উদ্দিন আহমেদ এবং তার পরিবারের কথা।

প্রবন্ধ

ডা. মোজাহারকে আজকের প্রজন্মের অনেকেই হয়তো চিনবেন না। কারণ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ১৯৭০ সালের শেষ দিকে। সত্তরের নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছেন। নির্বাচনের অল্প কিছুদিন পর এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাস তিনেক আগে তিনি চিরবিদায় নেন। তিনি রেখে গেছেন একটি আলোকিত, রাজনীতি সচেতন প্রগতিশীল পরিবার। তার ছেলে এবং নাতিদের কেউ কেউ রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত। সবাই অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতিতেই আছেন। আজকাল অনেক পরিবারেই দেখা যায়, পরিবারের সদস্যরা একেকজন একেক দলের কর্মী অথবা সমর্থক। এমনকি এক পরিবারে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত এবং হয়তো বামপন্থী সমর্থকও আছেন। কিন্তু ডা. মোজাহারের পরিবারে বিএনপি-জামায়াত নেই। এটি একটি বড় ব্যাপার বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে।

ডা. মোজাহার নিজে ছিলেন একজন চিকিৎসক এবং অত্যন্ত আধুনিক মন

মানসিকতার মানুষ। তিনি ব্রিটিশভারতে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাস করেছেন। তিনি বরাবর মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রাথমিক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন সেসময় প্রথম বিভাগে দুই বিষয়ে লেটার মার্কস পেয়ে। তিনি বরাবরই ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সে চা-বাগানে ডাক্তার হিসেবে চাকরি করতেন। কিন্তু ইংরেজ সাহেবের একটি অন্যায় কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দিতে দ্বিধা করেননি।

ডা. মোজাহার সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার আগে তার উত্তরাধিকারদের একটু পরিচিত না করলে অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না কেন তাকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত।

ডাক্তার সাহেবের বড় ছেলে, আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় খোকা ভাই, মোসাদ্দেকুল আলম। তিনি ছিলেন বোদা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। তার মতো বিনয়ী, হাসিখুশি, সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ এখন আর তেমন দেখা যায় না।

ডা. মোজাহারের আরেকপুত্র তরিকুল আলম। মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদ। আরেক ছেলে শামসুল আলম। মুক্তিযোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, অকাল প্রয়াত। এদের সবার সম্পর্কেই আমার আরো বলার কথা আছে। কিন্তু সেটা পর্যায়ক্রমে।

ডা. মোজাহারের পৈতৃক বাড়ি কিন্তু প্রামাণিকপাড়ায় নয়। তার পৈতৃক বাড়ি চিলাহাটি। তিনি ডাক্তারি পাস করে জলপাইগুড়িতে বসবাস করছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলে তিনি পাকিস্তান চলে আসেন এবং বসবাস করতে থাকেন রংপুর শহরে। আগেই বলেছি, তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন মুক্তচিন্তার অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ।

পাকিস্তানের ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তিনি সমর্থক ছিলেন না। তাই আওয়ামী লীগের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এই দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। তিনি রংপুর আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শামসুল হক এবং তখনকার উদীয়মান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ছিল তার পরিচিতি এবং ঘনিষ্ঠতা। রংপুরে তার সিটি ফার্মেসি ছিল আওয়ামী লীগের অঘোষিত অফিস। সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও গিয়েছেন, বসেছেন।

ডা. মোজাহার উদ্দিনের মতো একজন মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তিনি আমাকে পুত্রবত স্নেহ করতেন - এটা তো আমার জন্য কম গর্বের বিষয় নয়।

ডা. মোজাহার ছিলেন ভাষাসৈনিক। ১৯৫২ সালে রংপুরে ভাষা আন্দোলন সংঘটনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারির পর রংপুর পাবলিক লাইব্রেরির সামনে যে প্রথম শহীদ মিনার তৈরি করা হয়েছিল তার ইটও দিয়েছিলেন ডা. মোজাহার নিজের বাসার কাজের জন্য কেনা ইট থেকে।

কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার পর পরই তিনি রংপুরে আওয়ামী লীগের গোড়াপত্তনের কাজে লেগে পড়েন। তাকে কেন্দ্র করেই কার্যত রংপুরে আওয়ামী লীগ সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের স্বাভাবিকভাবেই সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে রংপুর থেকে তিনি যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কি এক বিশেষ কারণে তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিজে ডা. মোজাহারের কাছে এজন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, তার বিষয়টি তিনি পরে দেখবেন। তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় নেতা। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে খুব সহজেই মিশে যেতে পারতেন। তার আচার-ব্যবহারের কারণে মানুষ তাকে পছন্দ করতো, ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো।

১৯৫৮ সালে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান 'মার্শাল ল' জারি করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পাইকারিভাবে গ্রেফতার কর শুরু হয়। রংপুরের আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা হিসেবে ডা. মোজাহার উদ্দিনও গ্রেফতার হন। জেল থেকে বের হয়ে তিনি রংপুর ত্যাগের পর বোদায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। চিলাহাটি-শিলিগুড়ি-রংপুর হয়ে বোদা হয় তার স্থায়ী এবং শেষ ঠিকানা।

প্রামাণিকপাড়ায় তিনি কীভাবে এলেন? এটা ছিল আসলে তার নানা বাড়ি। একসময় তার নানা- মামারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা শোধ করতে না পারায় তাদের সম্পত্তি নিলাম হয়। ডা. মোজাহার নানা-মামাদের সম্পত্তি নিলামে ডেকে নেন। তারচেয়ে ৩০০ টাকা বেশি দাম হেঁকেও বালাভীড়ের প্রফুল্ল ঘোষের বাবা তারকনাথ সম্পত্তি কিনতে পারেননি। ডা. মোজাহার দাম হেঁকেছিলেন ১৪০০ টাকা আর তারকনাথ ১৭০০ টাকা। আরও একজন বীড করেছিলেন, তার নাম আমি জানতে পারিনি।

তো দ্বিতীয় হয়েও সম্পত্তি ডাক্তার সাহেব কীভাবে পেলেন?

সে-ও এক মজার কাহিনি। তিনি কি কোনো চালাকি করেছিলেন? না, সেরকম কিছু না।

নিলাম ডাকার দিনকয়েক পর তিনি চিলাহাটি থেকে বোদা আসছিলেন সাইকেলে করে। সাইকেল ছিল তার প্রিয় বাহন। আমরাও তাকে সাইকেল চালাতে দেখেছি। তিনি একটু ফিটফাট থাকতে পছন্দ করতেন। শার্ট ইন করে প্যান্ট পরতেন। মাথায় থাকতো সাহেবি হ্যাট। এই পোশাকে তাকে ভীষণ মানাতো এবং স্মার্ট লাগতো। তখন আমাদের মতো কিশোরদের কাছে তিনি রীতিমতো 'হিরো'।

যে কথা বলছিলাম, চিলাহাটি থেকে বোদা আসার পথে দেবীগঞ্জে কিছু লোক তার গতি রোধ করেন। না, কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে নয়। একজন গুরুতর রোগীকে জরুরিভাবে দেখার জন্য। পাস করা ডাক্তার হিসেবে ততদিনে মোজাহারউদ্দিনের একটি পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। কুচবিহার মহারাজার নায়েব থাকতেন দেবীগঞ্জে। তারই এক মেয়ে অসুস্থ হওয়ায় ডা. মোজাহারকে পথে পেয়ে একরকম জোর করে নায়েবের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

ডাক্তার মোজাহার মেয়েটিকে সুস্থ করে তোলেন। তখন নায়েব বাবু তার কাছে জানতে চান, মেয়ের চিকিৎসা বাবদ কি দিলে তিনি খুশি হবেন। ডাক্তার সাহেব প্রথমে কিছু নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু রাজার নায়েব বখশিস না দিয়ে ছাড়বেন কেন? বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকায় মামাদের সম্পত্তি নিলামের প্রসঙ্গটি তোলেন। নায়েব খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে মোট তিনজন নিলামে অংশ নিয়েছে। ডাক্তার সাহেবের অবস্থান দ্বিতীয়। ব্যস, নায়েব বাবু সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিলেন, ওই সব সম্পত্তি তার নামে বন্দোবস্ত দিয়ে দিতে। সম্পত্তির পরিমাণ দেড়/দুইশ বিঘার কম ছিল না।

এভাবেই বোদার প্রামাণিকপাড়া ডা. মোজাহার উদ্দিনের হলো।

রাজনীতির মানুষ ডা. মোজাহার উদ্দিন রংপুর থেকে বোদায় এসেও রাজনীতি থেকে দূরে যাননি। তখনকার দিনে রাজনীতি ছিল ত্যাগ ও আদর্শের। ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের পেছনে নেতারা ছুটতেন না। ডা. মোজাহার উদ্দিনও ছিলেন এই ধারারই রাজনীতিবিদ। বাইসাইকেল চালিয়েই তাদের দূর-দূরান্ত গিয়ে রাজনৈতিক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হতো। বক্তৃতা করার জন্য ছোট ব্যাটারিচালিত একধরনের হাত মাইক ব্যবহার করা হতো। সেটাও সাইকেলের ক্যারিয়ারেই বহন করা হতো।

সংসার জীবনে ডা. মোজাহার উদ্দিন ছিলেন এক সুখি পরিবারের অভিভাবক। তার ছেলেমেয়ে মোট ১২ জন। ৬ মেয়ে, ৬ ছেলে। তিনি দুটি বিয়ে করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ায় দ্বিতীয় বিয়ে করেন। দুই পক্ষেই তিন পুত্র, তিন কন্যা। তার ছেলে মোসাদ্দেকুল আলম খোকা, তরিকুল আলম, শামসুল আলম, শহীদুল আলম মনুর নামের সঙ্গে যতটা পরিচিত অন্য দুই ছেলে মাহমুদুল হাসান ও ফরিদুল আলমের সঙ্গে ততটা নই। কারণ শেষোক্ত দুইজন দীর্ঘদিন থেকেই বোদার বাইরে থাকেন। মোট ১২ সন্তানের মধ্যে তিন ছেলে ও তিন মেয়ে বেঁচে নেই। তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে জীবিত। তার এক মেয়ে শাহিদা আমার বান্ধবী। স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়েছি। এসএসসি পাস করেছি। শাহিদার বিয়ে হয়েছে চন্দনবাড়িতে। অথচ কতদিন ওর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। ওর কথা মনে হলো এই লেখাটি লিখতে গিয়ে। ডাক্তার মোজাহার একজন সচেতন ও বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। ছেলে- মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে তার কোনো অনীহা ছিল না। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন ভালো ঘরবর দেখেই।

এক মেয়ের জামাই ডাক্তার ছিলেন। ডা.ফজলুর রহমান। তার সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনিও খুব ভালো মানুষ ছিলেন। কিছুদিন তিনি বোদায়ও ছিলেন। আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সমর্থক ছিলেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু-হত্যা পরবর্তী কঠিন সময়ে আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনের কাজে ডা. ফজলুর রহমান ঝুঁকি নিয়েও ভূমিকা রেখেছেন, আমি নিজে তার সাক্ষী। তিনি পঁচাত্তর-পরবর্তী

সময়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চিকিৎসক হিসেবে চাকরি করেছেন। তখন তার সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তার দুই ছেলে বিদ্যুৎ ও বিপ্লবের সঙ্গেও আমার পরিচয় আছে।

তার আরেক মেয়ের বর আব্দুল আজিজ। একসময় জাঁদরেল ছাত্রনেতা ছিলেন। ঠাকুরগাঁও কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি এক সময় কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দিয়ে বোদা উপজেলা চেয়ারম্যানও হয়েছিলেন। এখনও রাজনীতিতে আছেন, তবে তার স্ত্রী মজিদা বেঁচে নেই। আজিজ ভাইয়ের মেয়ে পীননও ডাক্তারি পাস করেছে।

খোকা ভাই, তরিকুল ভাই এবং শামসুল ভাইকে নিয়ে বলার আছে অনেক কিছু। তারা তিন জনই রাজনীতির মানুষ। খোকা ভাই এবং শামসুল ভাই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। তরিকুল ভাই আছেন। কলেজের অধ্যাপনা পেশা থেকে অবসর নিলেও রাজনীতিতে সক্রিয় আছেন। তিনি বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা।

শহীদুল আলম মনু ছিল আমার ছোট ভাই নিরঞ্জনের ক্লাসফ্রেন্ড। দুঃখজনক ব্যাপার হলো আমার এই ছোট দুই ভাই-ই অকালে আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। নিরঞ্জন ডাকাতের হাতে নিহত হয় ১৯৮৪ সালে। আর মনু দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে মারা গেছে বছর কয়েক আগে। মনু আমাকে বড়ো ভাইয়ের মতোই শ্রদ্ধা করতো। স্বভাবের দিক থেকেও ও ছিল খুব নরম প্রকৃতির। বড়ো ভাই তরিকুল আলমের প্রভাবে মনু জাসদের রাজনীতির সঙ্গে জড়ালেও রাজনীতিটা ওর কাছে প্রধান বিষয় ছিল না। ঠিকাদারি ব্যবসা করে জীবন চলছিল। স্ত্রী এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছে মনু।

আমি হাই স্কুলে উঠেই ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। অষ্টম-নবম শ্রেণিতে তো রীতিমতো মিছিলে-স্লোগানে সামনের কাতারে। ছোটদের রাজনীতি, অর্থনীতি ছাড়াও রাজনীতিবিষয়ক বই তখন গোগ্রাসে গিলছি। পাঠ্য বইয়ের চেয়ে অপাঠ্য বইয়ের প্রতি আমার তখন প্রবল আগ্রহ। রাত জেগে পড়ি কিন্তু অনেকের কাছেই সেগুলো ছিল 'বাজে' পড়া। অভিভাবকদের কেউ কেউ আমাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। মনে করতেন আমার সঙ্গে মেলামেশা করলে তাদের ছেলে-মেয়েদের 'ফুটুর (future) ডুম'!

কিন্তু ডা. মোজাহার উদ্দিন ছিলেন ব্যতিক্রম। আমার ছাত্র সংগঠনে জড়িয়ে পড়াটা তিনি খারাপ চোখে দেখতেন না। আমার বেশ মনে আছে, তিনি আমাকে ছাত্রলীগ করার জন্য উৎসাহিত করতেন। কিন্তু আমাদের সময়ে বোদায় ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক ছিল বেশি। ছাত্রলীগ হাতে গোনা কয়েকজন। তাদেরই একজন তরিকুল আলম, ডা. মোজাহারের ছেলে, আমাদের তরিকুল ভাই। ডাক্তার সাহেব যেহেতু আওয়ামী লীগ করতেন সেহেতু আমরা ছাত্রলীগ করলে তিনি হয়তো খুশি হতেন। সেজন্যই তিনি আমাকে শেখ মুজিব, ছয় দফা- এসব বিষয়ে বলতেন, আগ্রহী করার চেষ্টা করতেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি বলেছিলেন, ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টির মীমাংসা আগে না হলে সমাজতন্ত্র হওয়া সম্ভব নয়। তখন যে এসব কথা ভালো বুঝতাম তা নয়। তবে আমাদের অবস্থান ছিল 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র'। ডা. মোজাহার আমাকে তার মতে টানতে না পারলেও তার প্রতি আমার ছিল বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ। বয়সে ছোট বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে আমার সঙ্গেও রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় তাকে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত দেখেছি। ইত্তেফাক পত্রিকার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর প্রথম যেদিন ইত্তেফাক পুনঃপ্রকাশ হলো তার কপি বোদা যাওয়ার পর সেই পত্রিকা হাতে ডা. মোজাহারের উদ্ভাসিত মুখচ্ছবি এখনও আমার চোখে ভাসে। আমি তখনই নিয়মিত পত্রিকা পড়তাম। তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনকার মতো ছিল না। এখন ঢাকার কাগজ সকালেই বোদাতেও পাওয়া যায়। আর ১৯৬৯-৭০ সালে দিনের পত্রিকা পাওয়া যেত পরের দিন বিকেলে। আমি ডাকযোগে দুটি পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম - দৈনিক আজাদ এবং সাপ্তাহিক পূর্বদেশ। ওই সময়ই আমি বোদা থেকে দৈনিক আজাদের মফঃস্বল সংবাদদাতা হয়েছিলাম।

ইত্তেফাক পুনঃপ্রকাশের পর ডাক্তার সাহেব আমাকে বললেন, এখন থেকে আজাদ না পড়ে ইত্তেফাক পড়বে। আজাদ হলো মুসলিম লীগের কাগজ। আর ইত্তেফাক হচ্ছে আওয়ামী লীগের। সংবাদদাতা হওয়ার কারণে আমার পক্ষে অবশ্য তখনই আজাদ ছাড়া সম্ভব হয়নি।

মোসাদ্দেক আলম খোকা

সেসময় ডা. মোজাহারের চার ছেলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল। খোকা ভাই, তরিকুল ভাই, শামসুল ভাই এবং মনু। অন্য দুইজন মাহমুদুল হাসান এবং ফরিদুল আলম তখন থেকেই ঢাকায়। এই দুই ছেলে চাকরিজীবী হওয়ায় সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বলেই মনে হয়।

খোকা ভাইয়ের পড়াশোনা অনেক আগেই শেষ হওয়ায় তিনি ততদিনে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়েছেন। নীলফামারী হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে খোকা ভাই রংপুর কারমাইকেল কলেজে ভর্তি হয়ে ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সম্ভবত এক্ষেত্রে তিনি পিতার সমর্থন ও আনুকূল্য পেয়েছিলেন। খোকা ভাই রংপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কারমাইকেল কলেজের ছাত্র হিসেবে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন।

খোকা ভাইয়ের পর তরিকুল ভাইও ছাত্রলীগের সঙ্গেই জড়িয়ে যান। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটান শামসুল ভাই, তিনি করতেন ছাত্র ইউনিয়ন। শামসুল ভাই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পড়াশোনা শেষ না করেই ময়মনসিংহ থেকে বোদা ফিরে যান। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্র রাজনীতিতে অতিরিক্ত মেতে ওঠার কারণেই শামসুল ভাইয়ের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। তিনি বোদায় ফিরে যাওয়ায় এবং ছাত্র ইউনিয়ন করার কারণে তার সঙ্গে দ্রুতই আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যদিও বয়সে এবং পড়াশোনায় তিনি আমার চেয়ে এগিয়েছিলেন তবু আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল যেন সমানে সমান।

আমি ১৯৭৩ সাল থেকে বোদা ছাড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একটু ঘনঘন বোদা গেলেও গত ৩০/৩৫ বছর ধরে আসা-যাওয়ার পরিমাণটা খুবই কমে গেছে। এখন বোদা গেলে অনেক কিছুই নতুন লাগে, অচেনা লাগে। মানুষজনও সব অপরিচিত। আমাকে এই প্রজন্মের অনেকেই হয়তো চেনে না।

দোকানপাট আগের মতো নেই। আমাদের সময় হাতে গোনা কয়েকটি দোকান ছিল। কাপড়ের দোকান দুটি। চা-মিষ্টির স্থায়ী দোকান দু'তিনটি। তারমধ্যে একটি ছবি মিষ্টান্ন ভান্ডার। জীতেন্দ্র মোহন সাহা ছিলেন তার মালিক। ছবি মিষ্টান্ন ভান্ডারের পাশে একটি ছোট ঘরে বসতেন ডা. মোজাহার। সেখানেই তিনি রোগী দেখতেন। রোগীদের তিনি শুধু রোগের জন্য ওষুধ নিতেন না। নানা ধরনের সৎ পরামর্শও নিতেন। তিনি আধুনিক কৃষির ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। কৃষির উন্নতি ছাড়া যে আমাদের উন্নতি হবে না, বিদেশ থেকে খাদ্য কিনে এনে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না,

খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর যে কোনো বিকল্প নেই- এসব কথা তিনি মানুষকে বলতেন এবং বোঝাতেন। আরও যেটা বলতেন সেটা হলো, পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকে বাঙালির মুক্তি নেই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণার পর তিনি তার পক্ষে প্রচার চালিয়েছেন। তার সঙ্গে ততোদিনে যোগ্য সহযোগী হিসেবে গড়ে উঠেছেন বড় ছেলে মোসাদ্দেকুল আলম খোকা।

আগেই উল্লেখ করেছি, খোকা ভাই নীলফামারী কলেজ থেকে ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাস করে রংপুর কারমাইকেল কলেজে ভর্তি হয়ে ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে, নীলফামারীতে ডা. মোজাহারের অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, আছেন। সাবেক সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং শক্তিমান অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরের বাবার সঙ্গেও ডাক্তার সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সম্পর্ক। খোকা ভাই এবং নূর ভাই মামাতো-ফুফাতো ভাই। নূর ভাইয়ের বাবা-মা দু'জনই অত্যন্ত প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার মানুষ ছিলেন।

খোকা ভাইয়ের মধ্যেও ছাত্রজীবন থেকেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। ডা. মোজাহার নিজে ছেলেকে রাজনীতির পাঠ শিখিয়েছেন। তিনি রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে ছেলেকে সঙ্গে নিতেন। খোকা ভাইয়ের বিয়ের কিছুদিন পরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন (টাঙ্গাইল, ১৯৫৭ সাল)। এই সম্মেলনে ডা. মোজাহার বড়ো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন। কাগমারী সম্মেলনেই আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয়, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জন্ম হয়। ডা. মোজাহার অন্য অনেকের সঙ্গে আওয়ামী লীগেই থেকে যান। আমৃত্যু তিনি আওয়ামী লীগেই ছিলেন। তার বড়ো ছেলে খোকা ভাইও আওয়ামী লীগার হিসেবেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে আব্দুল মালেক উকিল এবং আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ভাগ হয়ে বাকশাল গঠিত হলে খোকা কিছুদিন বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। অবশ্য অল্প সময় পরেই আওয়ামী লীগে ফিরে আসেন এবং দীর্ঘ দিন তিনি বোদা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

খোকা ভাইয়ের দুই ছেলে ফেরদৌস আলম পিটার এবং ফারুক আলম টবিও ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি সচেতন। ছাত্র সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পিটার এখন রাজনীতিতে সক্রিয় নেই। মানুষের সেবা করার এক ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছেন। রংপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে মানুষের চিকিৎসাসেবা কিছুটা সহজ করেছেন পিটার।

টবি বোদা পাথরাজ কলেজে অধ্যাপনার পাশাপাশি রাজনীতিতেও যথেষ্ট তৎপর আছেন। কলেজের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এবার তিনি বোদা উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও তিনি বোদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে দায়িত্ব পালন করছেন। একজন সৎ, সদালাপী, পরিশ্রমী এবং বিনয়ী মানুষ হিসেবে সবার কাছেই প্রশংসিত।

ডা. মোজাহার উদ্দিনের পরিবারের তিন সদস্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। খোকা ভাই ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। আর তরিকুল ভাই ও শামসুল ভাই সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। তারা দুই ভাই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। আগেই বলেছি তরিকুল ভাই ছাত্রলীগ করতেন, শামসুল ভাই করতেন ছাত্র ইউনিয়ন। স্বাভাবিকভাবেই তরিকুল ভাইয়ের চেয়ে শামসুল ভাইয়ের সঙ্গেই আমার সম্পর্কটা ছিল গভীর। শামসুল ভাই মানুষ হিসেবেও ভালো ছিলেন। আমি বোদা থাকতে এমন কোনো দিন ছিল না যে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা না দিয়েছি। ঢাকা আসার পরও তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বোদা গেলেই আমরা কত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। রাজনীতি ছাড়াও শিল্প-সাহিত্য-সমাজ-অর্থনীতি- কোনো বিষয়ই বাদ যেত না। শামসুল ভাই পড়াশোনা করতেন। তার পড়া নতুন কোনো বই নিয়েও আমরা আলোচনা করতাম, তর্ক-বিতর্কও করতাম। সব সময় সব বিষয়ে আমরা একমত হতাম, তা কিন্তু নয়। তবে আমাদের দ্বিমত আমাদের মধ্যে কোনো দূরত্ব তৈরি করেনি। মতান্তর কখনো মনান্তরের কারণ হয়নি। ১৯৮৬ সালে আমার বিয়ের কিছুদিন পর শামসুল ভাই ঢাকা এসেছিলেন। ঢাকা এলে আমার সঙ্গে দেখা করাকে তিনি তার কর্তব্য বলেই মনে করতেন। তো, সেবার কি কারণে আমি যেন একটু ব্যস্ত ছিলাম। তাকে সময় দিতে পারিনি।

> রাজনীতির মানুষ ডা. মোজাহার উদ্দিন রংপুর থেকে বোদায় এসেও রাজনীতি থেকে দূরে যাননি। তখনকার দিনে রাজনীতি ছিল ত্যাগ ও আদর্শের। ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের পেছনে নেতারা ছুটতেন না। ডা. মোজাহার উদ্দিনও ছিলেন এই ধারারই রাজনীতিবিদ। বাইসাইকেল চালিয়েই তাদের দূর-দূরান্ত গিয়ে রাজনৈতিক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হতো। বক্তৃতা করার জন্য ছোট ব্যাটারিচালিত একধরনের হাত মাইক ব্যবহার করা হতো

তিনি ঠিকই বড় ভাইয়ের কর্তব্য পালন করেছেন। আমার স্ত্রীকে নিয়ে চাইনিজ খাইয়েছেন, মহিলা সমিতি মিলনায়তনে নাটক দেখিয়েছেন।

শামসুল ভাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী কখনও ছিলেন না। শরীরের প্রতি খুব একটা যত্ন নিতেন বলেও মনে হয় না। বুকে একটা ব্যথার কথা মাঝেমাঝেই বলতেন। অনেক সময় কথা বলতে বলতে দুহাত দিয়ে বুক চেপে ধরতেন।

তারপর একসময় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বিদেশ পাঠানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল। ঢাকাস্থ বোদাবাসীদেরও একটা চেষ্টা ছিল। কিন্তু তিনি আমাদের সময় দিলেন না। অকালেই চলে গেলেন না-ফেরার দেশে।

এখন এটা জেনে ভালো লাগছে যে শামসুল ভাইয়ের বড় ছেলে অমিয় আলম অমি ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে উঠেছে। অমি বোদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। আশা করবো, বাবার স্মৃতি স্মরণ করে অমি সুস্থ ধারার ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গেই থাকবে। শামসুল ভাইয়ের আরো একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে আছে। মেয়েটির সম্ভবত পঞ্চগড়ে বিয়ে হয়েছে। ছোট ছেলেটি ঢাকায় পড়াশোনা করছে।

তরিকুল ভাই শুরুতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে থাকলেও এখন তিনি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)- এর একজন কেন্দ্রীয় নেতা। স্বাধীনতা লাভের পর পরই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) জন্মলাভ করলে তরিকুল ভাই জাসদের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি একবার জাসদের মশাল মার্কা নিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও অংশ নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক লাইন নিয়ে বিতর্কের পরিণতিতে জাসদ ভাগ হয়ে বাসদ নামে নতুন দল হলে তরিকুল ভাই বাসদে যান। এখনও বাসদেই আছেন। অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও রাজনীতি থেকে বিযুক্ত হননি। তিনি বোদা পাথরাজ কলেজের উপাধ্যক্ষ হিসেবে অবসর নিয়েছেন। শুনেছিলাম, কৃষি নিয়েও এক সময় তরিকুল ভাই কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। খুব সাফল্য হয়তো পাননি। রাজনীতির মত-পথ ভিন্ন হলেও তরিকুল ভাইয়ের সঙ্গেও বরাবর আমার সুসম্পর্ক ছিল এবং এখনও আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

ডা. মোজাহার এবং তার এই সমাজ ও রাজনীতি সচেতন পরিবারটি মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ধর্মান্ধতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক ধারা এগিয়ে নিতে বোদায় একটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।